কাসাসুল আম্বিয়া

নবী-রাসূলের আলোকিত জীবন

[১ম খণ্ড]

কাসাসুল আম্বিয়া

নবী-রাসূলের আলোকিত জীবন

[১ম খণ্ড]

ইমাম হাফিয

ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর দিমাশকী

[৭০০ – ৭৭৪ হি.]

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

অনূদিত

প্রকাশনায়

আনোয়ার লাইব্রেরী

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ | এপ্রিল ২০২০ইং

নবী-রাসূলের আলোকিত জীবন (১ম খণ্ড)

মূল | ইমাম হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা **ইসমাঈল ইবনে ইসমাঈল ইবনে কাসীর দিমাশকী**

অনুবাদ | কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

প্রকাশক | মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব | প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য | ৭০০.০০ টাকা মাত্র

অর্পণ

ভাতিজা
আইয়াশ দানিয়াল-কে

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

আরশ ও কুরসী সৃষ্টি সংক্রান্ত আলোচনা ১৩
লাওহে মাহফূয ২২
আকাশসমূহ পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যবর্তী বস্তুর সৃষ্টি ২৩
সাগর ও নদী ৩৭
আকাশসমূহ এবং এর মধ্যবর্তী নিদর্শনাবলি ৫৩
ছায়াপথ ও রংধনু ৭৬
ফেরেশতাদের সৃষ্টি এবং তাদের গুণাবলি ৭৯
জিনের সৃষ্টিগত আলোচনা এবং শয়তানের ঘটনা ১১৫
আদম আ.-এর সৃষ্টি সংক্রান্ত আলোচনা ১৩৭
আদম আ. ও মূসা আ.-এর প্রশ্নোত্তর ১৭৫
আদম আ.-এর সৃষ্টি সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ১৮১
আদম আ.-এর দুই সন্তান কাবীল ও হাবীলের ঘটনা ১৯৪
আদম আ.-এর ইন্তেকাল এবং শীসকে উপদেশ ২০৫
ইদরীস আ.-এর ঘটনা ২১১
নূহ আ.-এর ঘটনা ২১৫
নূহ আ. সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য ২৫৯
নূহ আ.-এর সাওম পালন ২৫৯
নূহ আ.-এর হজ্জ ২৬০
পুত্রের প্রতি নূহ আ.-এর উপদেশ ২৬০
হযরত হূদ আ.-এর ঘটনা ২৬৫
সামূদ সম্প্রদায়ের নবী হযরত সালিহ আ.-এর ঘটনা ২৯৩
গাযওয়ায়ে তাবূকের সময় সামূদ জাতির বাসস্থান হিজর উপত্যকা দিয়ে নবীজির গমন ৩১৫
হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ.-এর ঘটনা ৩১৯
হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে বিতর্কের ঘটনা ৩৩৯
ইবরাহীম আ.-এর শাম ও মিসরে হিজরত ৩৪৩
হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল আ.-এর জন্ম ৩৫১
ইসমাঈল আ. ও হাজেরাকে নিয়ে হযরত ইবরাহীম আ.-এর মক্কা ভূমিতে হিজরত ও কাবা গৃহ নির্মাণ ৩৫৪

বিষয় পৃষ্ঠা

ইসমাঈল যাবীহুল্লাহ আ.-এর ঘটনা ৩৬১
ইসহাক আ.-এর জন্ম ৩৭১
বায়তুল আতীক বা কাবাগৃহ নির্মাণ ৩৭৭
ইবরাহীম আ.-এর প্রশংসায় আল্লাহ ও রাসূল সা. ৩৮৫
জান্নাতে হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রাসাদ ৪০০
ইবরাহীম আ.-এর আকৃতি-অবয়ব ৪০০
হযরত ইবরাহীম আ.-এর ইনতিকাল ও তাঁর বয়স ৪০১
হযরত ইবরাহীম আ.-এর সন্তান-সন্ততি ৪০৫
ইবরাহীম আ.-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা ও তাদের উপর আল্লাহর আযাব ৪০৫
শুআইব আ.-এর জাতি মাদইয়ানবাসীর ঘটনা ৪২৭
ইবরাহীম আ.-এর সন্তান-সন্ততি ৪৪৭
হযরত ইসমাঈল আ.-এর ঘটনা ৪৪৮
হযরত ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আ. ৪৫৩
ইউসুফ ইবনে রাহীলের ঘটনা ৪৬১
হযরত আইয়ুব আ.-এর ঘটনা ৫৩১
যুল-কিফল-এর ঘটনা ৫৪১
গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনা ৫৪৫
ইয়াসীন সূরায় বর্ণিত জনপদবাসীর কাহিনী ৫৪৯
হযরত ইউনুস আ.-এর ঘটনা ৫৫৬
হযরত ইউনুস আ.-এর মর্যাদা ৫৬৭
মূসা কালীমুল্লাহ আ.-এর ঘটনা ৫৬৯
ফিরআউন ও তার বাহিনী ধ্বংসের ঘটনা ৬৫১
ফিরআউনের ধ্বংসোত্তর যুগে বনী ইসরাঈলের অবস্থা ৬৬৫
কুরআনের আলোকে মূসা আ.-এর ব্যক্তিত্ব ও দাওয়াহ কার্যক্রম ৬৮১

প্রারম্ভিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কিতাব আল-কুরআন উপহার দিয়েছেন, যাতে রয়েছে হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণের হাজারো উপকরণ। বিশেষ করে কুরআনের সুন্দরতম কাসাস তথা ঘটনাবলী আমাদের উপদেশ ও নসীহত গ্রহণের আমীয় বাণী। আল-কুরআনে অতীত কালের জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের ঘটনাবলী এবং কাহিনীগুলো বর্ণনা করে তাদের প্রকৃতি, স্বভাব, পরিণতি ও পরিণামের দিক নির্দেশ করে। অতীত কালের ইতিহাস নির্ভর, বিভিন্ন ঘটনা ও কিসসা বর্ণনা করা আল-কুরআনের মূল উদ্দেশ্য নয়। তবে অতীত কালের ঐতিহাসিক কাহিনী ও ঘটনার সঠিক বর্ণনা আল-কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সেই উপমা, উদাহরণ এবং কাহিনী চিত্রায়ণের উদ্দেশ্য হলো দীনি দাওয়াতকে মানুষের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরা। আল-কুরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের প্রাচীন জাতিসমূহ এবং প্রসিদ্ধ নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলীর বিবরণ অন্যতম। এ সকল কাহিনীর মধ্যে মানব জাতির সর্বস্তরে চিরকাল উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের বহুবিধ উপকরণ রয়েছে। আলোচ্য *কাসাসুল আম্বিয়া* গ্রন্থে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে নবী-রাসূলগণের জীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন জগদ্বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইমাম ইবনে কাসীর রহ.।

আমরা জানি, মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অনেক নবী—রাসূল নিযুক্ত করেছেন। নবীরা মানুষ ছিলেন।[১] তবে তাঁদেরকে নবী নিযুক্ত করে তাঁদের কাছে আল্লাহ নিজের বানী পাঠিয়েছেন। তাঁদেরকে তিনি সবকিছু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং তাঁরা একদিকে ছিলেন সত্য ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। অন্যদিকে ছিলেন উন্নত চরিত্র ও নিষ্পাপ জীবনের অধিকারী। ছিলেন আদর্শ মানুষ। তাঁরা অহীর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী লাভ করতেন। তাঁরা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করতেন না।

আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব করার জন্য। তাঁর হুকুম পালন করার জন্য। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য। সেই সাথে পৃথিবীটাকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য। এই হল মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ নবীদের পাঠিয়েছেন মানুষকে তাঁদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানিয়ে দিতে এবং কথাটা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে।

[১]. সুরা ইবরাহীম আয়াত ১১, সুরা আল কাহাফ আয়াত ১১০।

মহান আল্লাহ যাদের নবী নিযুক্ত করেছেন, তাঁরা সারা জীবন মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলেছেন। নফসের তাড়না এবং শয়তানের পথ পরিহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে তাঁদের অনুপ্রানিত করেছেন।

নবীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁর সন্তুষ্টির পথে জীবন যাপন করে, তবে মৃত্যুর পর যে চিরন্তন জীবন আছে, সেখানে তাঁরা মহা সুখে জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন ধারন করবেন না। মৃত্যুর পরের জীবনে তাঁদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি আর শাস্তি। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথের সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বলেই তাঁদেরকে নবী ও রাসূল বলা হয়। সকল রাসূলই নবী ছিলেন। তবে সকল নবী রাসূল ছিলেন না। অনেক নবীর কাছে আল্লাহ তায়ালা শুধু অহী পাঠিয়েছেন। আবার অনেক নবীর কাছে অহী এবং কিতাবও পাঠিয়েছেন। যারা সাধারণভাবে অহী লাভ করা ছাড়াও কিতাব লাভ করেছেন, তারাই ছিলেন রাসূল।

প্রথম নবী ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম আ.। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালাম। তাঁর পরে পৃথিবীতে আল্লাহ আর কোনো নবী নিযুক্ত করবেন না। পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা ঠিক কতজন মানুষকে নবী নিযুক্ত করেছেন, তা মানুষের পক্ষে কখনোই জানা সম্ভব নয়। একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালা এক লক্ষ বিশ হাজার নবী পাঠিয়েছেন। এদের মধ্যে তিনশত পনেরজন ছিলেন রাসূল। তবে তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

নবী-রাসূলগণের প্রতি অবশ্যি ঈমান আনতে হবে। কুরআনে যে পঁচিশজনের নাম উল্লাখ আছে, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি পৃথকভাবে ঈমান আনতে হবে। তাঁদের কারো প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। আর যেসব নবী-রাসুলের নাম কুরানে উল্লেখ করা হয়নি, তাঁদের প্রতি সামগ্রিকভাবে ঈমান আনতে হবে।

নবীগণ মানুষকে কল্যাণের পথে ডেকেছেন। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার অন্ধ মোহে লিপ্ত হয়ে নবীদের বিরোধিতা করেছে। তাঁদের অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়েছে। অত্যাচার নির্যাতন করেছে। অনেক নবীকে লোকেরা নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। আল্লাহর এই মহান নবীগণকে মানুষ হত্যা করার কূট-কৌশল করেছে। অগনিত নবীকে তাঁরা হত্যা করেছে। কাউকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছে। কাউকে তারা হত্যা করার জন্য তাড়া করেছে। কাউকে হত্যা করার জন্য বাড়ি ঘেরাও করেছে। এত চরম বিরোধিতা স্বত্তেও নবীগণ সত্য পথের দিকে দাওয়াত দান থেকে কখনই বিরত থাকেননি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষকে

সত্য পথে আসার আহবান জানিয়ে গেছেন। তাঁরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাজ গড়ার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এখন আমাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হল যে, পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ দুটি। একটি হল নবীদের দেখানো পথ। এটিই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ। এ পথের প্রতিদান হল জান্নাত বা বেহেশত।

অপরটি হল আল্লাহদ্রোহীতার পথ। এটি আল্লাহকে অমান্য করার পথ। আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ। নবীদের অমান্য করার পথ। শয়তানের পথ। আত্মার দাসত্বের পথ। এ পথের পরিনাম হল জাহান্নাম, চির শাস্তি, চির লাঞ্ছনা, চির অকল্যান আর ধ্বংস। আমাদেরকে চলতে হবে আল্লাহর পথে। চলতে হবে নবীদের পথে। নবীদের দেখানো পথই হল আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ। নবীদের পথই দুনিয়ার কল্যাণের পথ। নবীদের পথই জান্নাতের পথ। নবীদের পথ শান্তির পথ। নবীদের দেখানো পথ সুন্দর পৃথিবী গড়ার পথ। নবীদের দেখানো পথ আদর্শ মানুষ হবার পথ। নবীদের পথ উন্নতির পথ, শ্রেষ্ঠত্বের পথ।

তাই আসুন আমরা নবীদের জীবনী পড়ি। তাঁদের আদর্শকে জানি। তাঁদের ভালোবাসি। তাঁদের আদর্শের অনুসরন করি এবং তাঁদের দেখানো পথে চলি। আল-কুরআনে বর্ণিত কাসাস জীবন ও জগত সম্পর্কে মানব জাতির অতীত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। জীবন ও জগত সম্পর্কে মানুষ তার নিজের পুর্বধারণা, তার স্বজাতীয় অতীত ঘটনাবলী, কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যালোচনা করেই ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করে, সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। মানব জাতির নৈতিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক সম্পর্ক হোক, আর রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হোক অতীত ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেই তাদের সুখ, দুঃখ, ভালো-মন্দের মাপকাঠি নির্ণীত হয়। আল-কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও সভ্যতার আলোচনা দ্বারা শিক্ষা প্রদানই আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য। আল-কুরআনে উল্লিখিত সকল কিসসাই ব্যক্তির জীবনে কোনো না কোনো স্তরে উপকার দিচ্ছে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আছে। তাই আমরা গ্রন্থকারের বিন্যাসিত নবী-রাসূলগণের জীবনীভাষ্যের শেষদিকে ড. মোঃ আব্দুল কাদের প্রণীত 'নবী-রাসূলগণের ঘটনায় রয়েছে শিক্ষা' অবলম্বনে কয়েকজন নবীর ঘটনাবলী থেকে উপদেশ গ্রহণের এবং শিক্ষনীয় বিষয়ের দিক-নির্দেশনা প্রাপ্তি নিয়ে আলোচনা করেছি।

স্মর্তব্য, আলোচ্য গ্রন্থটি মূলত *কাসাসুল আম্বিয়া* গ্রন্থের অনূদিত রূপ। নবী-রাসূলগণের জীবনী সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন বিশ্বনন্দিত মুসলিম মনীষী ও বিখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনে কাসীর রহ.। আমরা আশা করি নবী-রাসূলদের ঘটনাবলির আলোচনা প্রাণের উর্বরতা ও ঈমানের সজীবতা বৃদ্ধিতে সকলের সহায়ক হবে।

তাঁদের জীবনের বিশাল পৃষ্ঠায় শিহরণ-জাগানিয়া বহু মূল্যবান ঘটনা আমাদের অন্ধকার হৃদকমলে দেখাবে সফেদ আলো। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বাড়তি কিছু বলা বাহুল্য মনে করছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা আরবী প্রতিবর্ণায়নের প্রাচীন রীতি অনুসরণ করেছি। মূল পাঠের অনুবাদে সহায়তা নেওয়া হয়েছে *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার*। কুরআনে তরজমা গ্রহণ করা হয়েছে *আল-বায়ান* থেকে। হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনূদিত ও বাংলা হাদীস কর্তৃক সংযোজিত সংস্করণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় অংশে সংযোজন করা হয়েছে টীকা ও নোট।

দেশের প্রতিশ্রুতিশীল ও স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আনোয়ার লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপক মুহতারাম মাওলানা মোস্তফা সাহেব যেভাবে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়ে অনুবাদকর্মে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন তা এককথায় বর্ণনাতীত। তাঁর নিষ্ঠা, ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাকে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ঋণের শিকল পরিয়ে দিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শোকর আদায় করছি, যিনি আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি সম্পন্ন করার তাওফিক দিয়েছেন। সেই বরকতওয়ালা সত্তা যেন আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ -এর পরিপূর্ণ ইত্তেবা ও অনুসরণ করে জীবন ও মৃত্যু দান করেন।

এ কথা কারও অজানা নয় যে, নবী-রাসুলের জীবনীভিত্তিক বই শুধু বই-ই নয়; তা একটি অমূল্য রত্ন। সাফল্যের সিঁড়ি। সোনালি জীবনের সোপান। বিশেষ করে আকাবিরদের লেখা বই-পুস্তক আমাদের ঈমানের খোরাক। আমলে জজবা আনার অন্যতম উপায়। তাই একটি নির্ভুল, সুন্দর ও সহজপাঠ্য বই লেখা, অনুবাদ করা বা পড়া সকলেরই ঐকান্তিক কাম্য। তথাপি মানুষ তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অনুবাদ কাজে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসামঞ্জস্যতা, ভাষা প্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠকেরা এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মৌলিক কোনো বিচ্যুতি চোখে পড়লে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে—ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কাজে বরকত দিন এবং কবুলিয়াতের বারিধারায় সিক্ত করুন।

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
ঢালকানগর, ঢাকা।
২৮ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী।

আরশ ও কুরসী সৃষ্টি সংক্রান্ত আলোচনা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ

"আল্লাহ সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি।"[২]

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿۱۱۶﴾

"সুতরাং সত্যিকারের মালিক আল্লাহ মহিমান্বিত, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত আরশের রব।"[৩]

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۸۶﴾

"বলো, 'কে সাত আসমানের রব এবং মহা আরশের রব'?"[৪]

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿۱۴﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿۱۵﴾

"আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, প্রেমময়। আরশের অধিপতি, মহান।"[৫]

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿۵﴾

"দয়াময় আরশে সমাসীন।"[৬]

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এমন বহু আয়াত রয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا

"যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসা-সহ তাসবীহ পাঠ করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং মুমিনদের জন্য

---

২. সূরা গাফির : আয়াত-১৫।
৩. সূরা মুমিনূন : আয়াত-১১৬।
৪. সূরা মুমিনূন : আয়াত-৮৬।
৫. সূরা বুরূজ : আয়াত-১৪-১৫।
৬. সূরা তোয়াহা : আয়াত ৫। এ আয়াতে আল্লাহর একটি ক্রিয়াবাচক গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে **استواء** বা আরশের উপর ওঠা। ইমাম মালেককে এ গুণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, **استواء** এর অর্থ জানা আছে। তবে তার ধরন (**كيفيت**) জানা নেই। এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বিদআত। এ নীতিটি আল্লাহর সকল গুণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ক্ষমা প্রার্থনা করে আর বলে হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন।"[৭]

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۵﴾

"আর তুমি ফেরেশতাদেরকে আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করতে দেখতে পাবে। আর তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করে দেওয়া হবে এবং বলা হবে সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য।"[৮]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বিপদকালীন দুআয় আছে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। যিনি মহান ও ধৈর্যশীল। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই আসমান জমিনের প্রতিপালক ও মহান আরশের প্রভু।"[৯]

ইমাম আহমাদ রহ. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে বাহা নামক স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময়ে একখণ্ড মেঘ অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা কি জান এগুলো কী? আমরা বললাম, মেঘমালা! তিনি বললেন, সাদা মেঘ বলতে পার। আমরা বললাম সাদা মেঘ। তিনি বললেন, আনানও (মেঘ) বলতে পার। আমরা বললাম ওয়াল আনান। তারপর বর্ণনাকারী বললেন, আমরা নীরব থাকলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান যে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দূরত্ব কতটুকু? আব্বাস রা. বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন, উভয়ের মাঝে পাঁচশ বছরের দূরত্ব। এক আকাশ থেকে আরেক আকাশ পর্যন্ত পাঁচশ বছরের দূরত্ব, প্রত্যেকটি আকাশ পাঁচশ বছরের দূরত্ব সমান পুরু এবং সপ্তম আকাশের উপরে একটি সমুদ্র আছে যার উপর ও নিচের মধ্যে ঠিক ততটুকু দূরত্ব; যতটুকু দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে। তারপর তার উপরে আছে আটটি পাহাড়ি মেষ, যাদের হাঁটু ও ক্ষুরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বের সমান দূরত্ব। তাদের পিঠের উপরে আল্লাহর আরশ অবস্থিত, যার উপর ও নিচের ব্যবধান (উচ্চতা) দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপরে রয়েছেন বরকতময় মহান আল্লাহ। কিন্তু বনী আদমের কোনো আমলই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

---

৭. সূরা গাফির : আয়াত-৭।
৮. সূরা যুমার : আয়াত-৭৫।
৯. সহীহ বুখারী : ৬৩৪৫, ৬৩৪৬,৭৪৩১; সহীহ মুসলিম : ২৭৩০।

ভাষ্যটি ইমাম আহমাদ রহ. এর। আর ইমাম আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ[১০] ও তিরমিযী রহ. সিমাক রা. সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। আবার শুরাইক সিমাক থেকে এ হাদীসটির অংশবিশেষ মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর শব্দ হলো: "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা কি জান, আসমান ও জমিনের মাঝে কতটুকু দূরত্ব? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ হচ্ছে একাত্তর বা বাহাত্তর বা তিয়াত্তর বছরের সমান। তারপর এর মতোই দূরত্বে প্রথম আসমান, এভাবে পর পর সাতটি আসমানের দূরত্ব নির্দেশ করলেন।"[১১]

যুবায়ের ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যুবায়ের ইবনু মুতঈম তার পিতা থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! লোকজন খুব কষ্ট করছে, পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ধন-সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে এবং জীব-জন্তু মারা যাচ্ছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করুন।

কেননা আমরা আপনার সুপারিশ নিয়ে আল্লাহর নিকট যাই এবং আল্লাহর সুপারিশ নিয়ে আপনার নিকট আসি। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি কি জান! তুমি কি বলছ? এরপর তিনি তাসবীহ পড়তে থাকলেন, এমনকি তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও এর (অসন্তুষ্টির) চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো।

তিনি আবার বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। আল্লাহর সুপারিশ নিয়ে তাঁর কোনো সৃষ্টির নিকট যাওয়া যায় না। আল্লাহর মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে, অনেক মহান। তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি জান আল্লাহ কে? তাঁর আরশ আসমানের উপর এভাবে আছে। তিনি আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, তার উপর রয়েছে গম্বুজসদৃশ ছাদ। তা সত্ত্বেও তা (আরশ) তাকে নিয়ে গোর মতো শব্দ করে, যেমনটি করে আরোহীর কারণে জিনপোষ। ইবনু বাশশার তার হাদীসে বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে এবং তাঁর আরশ আসমানসমূহের উপরে। এরপর হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১২]

হাফিয আবুল কাসিম ইবনে আসাকির দামেশকী রহ. এ হাদীসের বিরুদ্ধে *বায়ানুল*

[১০]. তাখরীজ কুতুবুত সিত্তাহ: তিরমিযী ৩৩২০, আবু দাউদ ৪৭২৩। তাহকীক আলবানী: যঈফ। তাখরীজ আলবানী: আবু দাউদ ৪৭২৩ যঈফ, মিশকাত ৫৭২৬ যঈফ, যঈফা ১২৪৭, যিলালুল জান্নাহ ৫৭৭। উক্ত হাদিসের রাবী ওয়ালীদ বিন আবু সাওর আল হামদানী সম্পর্কে ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবু যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন ও মুনকারুল হাদীস। ইয়াকুব বিন সুফইয়ান ও সাকিহ জাযারাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবু হাতীম আর রাযী বলেন, তার থেকে যাচাই করে হাদীস লিখা যায়।

[১১]. আবু দাউদ: ৪৭২৩। ইবনু মাজাহ, আহমাদ। আহমাদ শাকির বলেন, এর সনদ খুবই দুর্বল। সনদে রয়েছে ইয়াহইয়া ইবনুল আলা। হাফিয বলেন, তার ওপর হাদীস জাল করার অভিযোগ আছে।

[১২]. আবু দাউদ : ৪৭২৬।

ওয়াহমি ওয়াত তাখলীতিল ওয়াকিয়ি ফী হাদীসিল আতীত নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন। তিনি হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাশশার এর সমালোচনায় তার সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন এবং এ ব্যাপারে অনেকের মতামত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ছাড়া অন্য রাবী থেকে ভিন্ন সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে জারীর তাঁদের তাফসীরদ্বয়ে, ইবনে আবু আসিম ও তাবারানী তাঁদের *কিতাবুস সুন্নাহ*'য়, বাযার তাঁর মুসনাদে এবং হাফিয যিয়া আল মাকদেসী তাঁর *মুখতারাত* গ্রন্থে উমর ইবনে খাত্তাব রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। উমর রা. বলেন, এ কথা শুনে তিনি আল্লাহ তাআলার মহিমা বর্ণনা করে বললেন: "নিঃসন্দেহে তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত এবং তা নতুন বাহন বোঝার ভারে শব্দ করার ন্যায় শব্দ করে।"

এ হাদীসের সনদ তেমন প্রসিদ্ধ নয়। *সহীহ বুখারী*তে আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন ফিরদাউস জান্নাত চাইবে। কারণ, সেটি হচ্ছে সবচেয়ে প্রশস্ত ও সবচেয়ে উচ্চ জান্নাত। আর দয়ালু (আল্লাহর) আরশটি এরই উপর অবস্থিত।"[১৩]

فوقه শব্দটি **ظرف** হিসেবে ফাতহ দ্বারাও পড়া হয় এবং যাম্মা দ্বারাও পড়া হয়। আমাদের শায়খ হাফিয আল মিযযী রহ. বলেন, যাম্মা দ্বারা পড়াই উত্তম। তখন **فَوْقُهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ**-এর অর্থ হবে **اعلاها عَرْشُ الرَّحْمَنِ**। অর্থাৎ তার উপরটা হলো রাহমানের আরশ। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, ফিরদাউসবাসীরা আরশের শব্দ শুনে থাকে। আর তা হলো তার তাসবীহ ও তাযীম। তাঁরা আরশের নিকটবর্তী বলেই এমনটি হয়ে থাকে।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "সাদ ইবনু মুআয রা.-এর মৃত্যুতে আল্লাহ তাআলার আরশ কেঁপে উঠেছিল।"[১৪]

হাফিয ইবনে হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে উসমান ইবনে আবু শায়বা *সিকতুল আরশ* গ্রন্থে লিখেন: "আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা তৈরি। তার প্রান্তদ্বয়ের দূরত্ব হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ।"

تَعْرُجُ الْمَلَٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝

"ফেরেশতারা ও রূহ এমন এক দিনে আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বগামী হয়, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।"[১৫] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা উল্লেখ করেছি: আরশ ও সপ্তম

[১৩]. সহীহ বুখারী : ২৭৯০, ৭৪২৩।

[১৪]. সহীহ বুখারী : ৩৮০৩; সহীহ মুসলিম : ২৪৬৬।

[১৫]. সূরা মাআরিজ: আয়াত ৪।

জমিনের মধ্যকার দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ এবং তার বিস্তৃতি পঞ্চাশ হাজার বছরের পথের সমান।

একদল কালাম-শাস্ত্রবিদের মতে, আরশ হচ্ছে গোলাকার একটি আকাশবিশেষ যা গোটা জগতকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এ কারণেই তারা একে নবম আকাশ, 'আল ফালাকুল আতলাস ওয়াল আসীর' নামে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু তাদের এ কথাটি যথার্থ নয়। কারণ, শরীয়তে এ কথা প্রমাণিত যে, আরশের কয়েকটি স্তম্ভ আছে এবং ফেরেশতারা তা বহন করে থাকেন। কিন্তু আকাশের স্তম্ভও হয় না এবং তা বহনও করা হয় না। তাছাড়া আরশের অবস্থান জান্নাতের উপরে আর জান্নাত হলো আকাশের উপরে এবং তাতে একশটি স্তর আছে, প্রতি দু-স্তরের মাঝে আকাশ ও জমিনের মধ্যকার সমান দূরত্ব। এতে প্রমাণিত হয় যে, আরশ ও কুরসীর মাঝের দূরত্ব আর এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্ব এক কথা নয়।

আরেকটি যুক্তি হলো, অভিধানে আরশ অর্থ রাজসিংহাসন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: "তার আছে বিরাট এক সিংহাসন।"[১৬] বলাবাহুল্য, এ আয়াতে যে আরশের কথা বলা হয়েছে তা কোনো আকাশ ছিল না এবং আরশ বলতে আরবরা তা বুঝেও না। অথচ কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।

মোটকথা, আরশ কয়েকটি স্তম্ভবিশিষ্ট একটি সিংহাসনবিশেষ– যা ফেরেশতারা বহন করে থাকেন। এটা বিশ্বজগতের উপরে অবস্থিত গম্বুজের ন্যায় আর তা হলো সৃষ্টি জগতের ছাদস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا

"যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসা-সহ তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে যে, 'হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন।"[১৭]

পূর্বে উল্লেখিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, তারা হলেন আট জন এবং তাদের পিঠের উপর রয়েছে আরশ। আল্লাহ তাআলা বলেন: "ফেরেশতাগণ আসমানের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে। সেদিন তোমার রবের আরশকে আট জন ফেরেশতা তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে।"[১৮]

শাহর ইবনে হাওশাব রহ. বলেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতা হলেন আট জন। তাঁদের

[১৬]. সূরা নামাল : আয়াত-২৩।
[১৭]. সূরা গাফির : আয়াত-৭।
[১৮]. সূরা হাক্কাহ : আয়াত-১৭।

চার জনের তাসবীহ হলো : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك
আর অপর চার জনের তাসবীহ হলো :

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك

ইমাম আহমাদ রহ. ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. উমাইয়া ইবনে আবুস সালত এর কবিতার দুটি পঙ্ক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, উমাইয়া যথার্থ বলেছে। এ হাদীসের সনদ সহীহ[১৯] এবং তার

[১৯]. **হাদীস বিষয়ক কিছু পরিভাষা যা আমাদের জানা থাকা জরুরী :** হাদীসের ব্যাবহারিক সংজ্ঞাঃ হাদীস বলতে সাধারনতঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কর্ম বা অনুমোদনকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যা বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে হাদীস বলা হয়। এবং হাদীস বলে যা জানা যায় তা সত্যিই রাসুল (সাঃ) এর কথা কিনা তা যাচাই করে নির্ভরতার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিভিন্ন প্রকারে ও পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি এমন আরও কিছু শব্দের সহজ সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হল

মুহাদ্দিস : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের 'সনদ' ও 'মতন' সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

সনদ : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সুত্র পরম্পরায় হাদীসের গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে 'সনদ' বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদীসের মূল কথা বা বক্তব্য ও তার শব্দ সমষ্টিকে 'মতন' বলে।

রিওয়ায়াত : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলে। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে। হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলা হয়।

সাহাবী : যে ব্যাক্তি ঈমানের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ : সাহাবীদের ঠিক পরের প্রজন্মের কোন ব্যক্তি যিনি রাসুল (সাঃ) এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততঃপক্ষে সাহাবীকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে তাবিঈ বলে।

মারফু হাদীস : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুরু হয়, তাকে মারফু হাদীস বলে। অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে মারফু হাদীস বলে।*

মাওকুফ হাদীস : সাহাবীগনের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে মাওকুফ হাদীস বলে।*

মাকতু হাদীস : তাবেয়ীগনের কথা, কর্ম বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদিসকে মাকতু হাদীস বলে।*

মুত্তাসিল হাদীস : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পরেনি, তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুরসাল হাদীস : যে হাদীসের সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছে, তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

সহীহ হাদীস : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীসের মধ্যে ৫ টি শর্ত পূরণ হয়েছে তাকে সহীহ হাদীস বা বিশুদ্ধ হাদীস বলে। শর্ত ৫ টি হল—

১. হাদীসের সকল বর্ণনাকারী বা রাবী পরিপূর্ণ সৎ ও বিশ্বস্ত বলে প্রমানিত। একে 'আদালত' বলে।
২. সকল রাবীর 'নির্ভুল বর্ণনা ক্ষমতা' পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলে প্রমানিত। একে 'যাবতা' বলে।
৩. সনদের প্রত্যকে রাবী তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদিসটি শুনেছেন বলে প্রমানিত। একে 'ইত্তিসাল' বলে।
৪. হাদীসটি অন্যান্য প্রমানিত হাদীসের বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমানিত। একে 'শুযুয মুক্তি' বলে।
৫. হাদিসটির মধ্যে সূক্ষ্ম কোন সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি নেই বলে প্রমানিত। একে 'ইল্লাত মুক্তি' বলে।

হাসান হাদীস : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যেসব হাদীসে সহীহ হাদীসের ৫ টি শর্ত বিদ্যমান, কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ, 'যাবতা' বা হাদীস বর্ণনাকারীর 'নির্ভুল বর্ণনা ক্ষমতা' কিছুটা দুর্বল বলে বোঝা যায়, সেই হাদিসকে হাসান হাদীস বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বলা হয়। অর্থাৎ, যদি সনদে উল্লেখিত কোন একজন রাবীর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে এইরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীস 'হাসান হাদীস' বলে গন্য।

বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আরশ বহনকারীদের বর্তমান সংখ্যা চার জন। অতএব, পূর্বোক্ত হাদীসের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এ ধরনের (এ চার জনের) উল্লেখের দ্বারা বাকি চার জনের অস্তিত্বের অস্বীকৃতি বোঝায় না। আল্লাহ সম্যক অবগত। |

আরশ সম্পর্কে উমাইয়া ইবনুস সাত এর আরও কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আছে। তা হলো:

مَجِّدُوا اللَّهَ فَهُوَ لِلْمَجْدِ أَهْلٌ ... رَبُّنَا فِي السَّمَاءِ أَمْسَى كَبِيرَا
بِالْبِنَاءِ الْعَالِي الَّذِي بَهَرَ النَّاسَ ... وَسَوَّى فَوْقَ السَّمَاءِ سَرِيرَا
شَرْجَعًا لَا يَنَالُهُ بَصَرُ الْعَيْنِ ... تَرَى حَوْلَهُ الْمَلَائِكُ صُورَا

"তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর। তিনি মহিমময়, আমাদের প্রতিপালক আকাশে, তিনি মহীয়ান গরীয়ান। সে এমন এক সুউচ্চ ছাদ যা মানুষকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দেয়। আকাশের উপরে তিনি স্থাপন করে রেখেছেন এমন সুউচ্চ এক সিংহাসন, চর্মচক্ষু যার নাগাল পায় না আর তার আশে-পাশে তুমি দেখতে পাবে ঘাড় উঁচিয়ে রাখা ফেরেশতাদের।"

صُور বহুবচন। এর অর্থ হলো, সে ব্যক্তি উপরের দিকে তাকিয়ে থাকার দরুন তার ঘাড় বাঁকা হয়ে আছে। شَرْجَع অর্থ অত্যন্ত উঁচু। سَرِير অর্থ হলো সিংহাসন।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-এর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি; যিনি স্ত্রী কর্তৃক দাসীর সঙ্গে যৌন মিলনের অপবাদের মুখে কুরআন পাঠের পরিবর্তে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করেন–

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ... وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَا
وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ ... وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَا

ফিকহবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান নির্ধারণ করেন।

যঈফ বা দুর্বল হাদীস : যে হাদীসের মধ্যে হাসান হাদীসের শর্তগুলি অবিদ্যমান দেখা যায়, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাকে যঈফ হাদীস বলে। অর্থাৎ

- রাবীর বিশ্বস্ততার ঘাটতি, বা
- তাঁর বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা বা স্মৃতির ঘাটতি, বা
- সনদের মধ্যে কোন একজন রাবী তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে সরাসরি ও স্বকর্ণে শোনেননি বলে প্রমানিত হওয়া বা দৃঢ় সন্দেহ হওয়া, বা
- অন্যান্য প্রমানিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া, অথবা
- সূক্ষ্ম কোন সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি থাকা; ইত্যাদি যে কোন একটি বিষয় কোন হাদীসের মধ্যে থাকলে হাদিসটি যঈফ বলে গণ্য। কোন হাদিসকে 'যঈফ' বলে গণ্য করার অর্থ হল, হাদিসটি রাসুল (সাঃ) এর কথা নয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

মাউযু হাদীস বা বানোয়াট হাদীসঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃত ভাবে রাসুল (সাঃ) এর নামে বানোয়াট কথা সমাজে প্রচার করেছে অথবা, ইচ্ছাকৃত ভাবে হাদীসের সুত্র (সনদ) বা মূল বাক্যের মধ্যে কমবেশি করেছে বলে প্রমানিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদিসকে বানোয়াট বা মাউযু হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

গরীব হাদীস : যে সহীহ হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

وَتَحْمِلُهُ مَلَائِكَةٌ كِرَامٌ ... مَلَائِكَةُ الْإِلَهِ مُسَوِّمِينَا

"আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং জাহান্নাম হলো কাফিরদের ঠিকানা। আর আরশ পানির উপর ভাসমান এবং আরশের উপর রয়েছেন জগতসমূহের প্রতিপালক। যে আরশ বহন করেন সম্মানিত এবং আল্লাহর চিহ্নিত ফেরেশতারা।"[২০]

ইবনে আবদুল বার রহ. প্রমুখ ইমাম তা বর্ণনা করেছেন।[২১] আবু দাঊদ রহ. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. সূত্রে বর্ণনা করেন,[২২] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: "আমাকে আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের একজনের বিবরণ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার কানের লতি ও কাঁধের মাঝে সাতশ বছরের পথ।"

ইবনে আবু আসিমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনে জারীর রহ. বলেন,[২৩] হাসান বসরী রহ. বলতেন, কুরসী আর আরশ একই। কিন্তু এ তথ্যটি সঠিক নয়, হাসান এমন কথা বলেননি। বরং সঠিক কথা হলো, হাসান রহ.-সহ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের অভিমত হলো: কুরসী আর আরশ দুটি আলাদা। আর ইবনে আব্বাস রা. ও সাঈদ ইবনে যুবায়ের রা. সম্পর্কে বর্ণিত, তারা আল্লাহর বাণী: "আসন আসমান ও জমিনব্যাপী হয়ে আছে[২৪]" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন– 'আল্লাহর ইলম'। কিন্তু ইবনে আব্বাস রা.-এর প্রকৃত অভিমত হলো, কুরসী হচ্ছে আল্লাহর কুদরতী কদমদ্বয়ের স্থল আর আরশের সঠিক পরিমাপ আল্লাহ ব্যতীত কারও জানা নেই।

এ বর্ণনাটি হাকিম তার মুসতাদরাকে বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যদিও তারা তা বর্ণনা করেননি।[২৫]

আবার শুমা ইবনে মুখাল্লাদ ও ইবনে জারীর তাদের নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেন, কুরসী হলো আরশের নিচে। সুদ্দীর নিজস্ব অভিমত হলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কুরসীর পেটের মধ্যে আর কুরসীর অবস্থান আরশের সম্মুখে।

ইবনে জারীর ও ইবনে আবু হাতিম[২৬] যাহহাক সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সাত আসমান ও সাত জমিনকে যদি পাশাপাশি বিছিয়ে একটির সঙ্গে অপরটি জুড়ে দেওয়া হয়, তাহলে কুরসীর তুলনায় তা বিশাল

---

[২০]. আননিহায়া : ২/৪২৫।
[২১]. আল-ইসতীআব : ৩/৯০০-৯০১।
[২২]. সুনানু আবী দাঊদ : ৪৭২৭।
[২৩]. তাফসীরে তাবারী : ৩/১০।
[২৪]. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৫।
[২৫]. আল মুসতাদরাক : ২/৩১০।
[২৬]. তাফসীরে ইবনে হাতিম : ১/৩১০।

আয়তনের মধ্যে একটি আংটিতুল্য। ইবনে জারীর বর্ণনা করেন,[২৭] যায়েদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "কুরসীর মধ্যে সাত আকাশ ঠিক একটি গালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি মুদ্রাতুল্য। যায়েদ বলেন, আবু যর রা. বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি: "আরশের মধ্যে কুরসী ধূ ধূ প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত লোহার আংটির চাইতে বেশি কিছু নয়।" প্রথম হাদীসটি 'মুরসাল'[২৮] আর আবু যর রা.-এর হাদীসটি 'মুনকাতা' তথা সূত্রবিচ্ছিন্ন।

হাকিম আবু বকর ইবনে মারদূয়েহ রহ. তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেন, আবু যর গিফারী রা. রাসূলুল্লাহ সা.-কে কুরসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: "যার হাতে আমার জীবন সে সত্তার শপথ! কুরসীর নিকট সাত আকাশ ও সাত জমিন বিশাল প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত কড়া অপেক্ষা বেশি কিছু নয়। আর কুরসীর তুলনায় আরশ প্রান্তরের তুলনায় কড়ার মতো।"

সাঈদ ইবনে যুবায়ের রা. থেকে যথাক্রমে মিনহাল ইবনে আমর আমাশ সুফইয়ান, ওকী ও ইবনে ওকী সূত্রে ইবনে জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-কে وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, পানি কিসের উপর ছিল? জবাবে তিনি বললেন, বাতাসের পিঠের উপর। তিনি আরও বলেন, আসমান ও জমিনসমূহ এবং এসবের মধ্যকার সমুদয় বস্তুকে সমুদ্র ঘিরে রেখেছে এবং সমুদ্ররাজিকে ঘিরে রেখেছে হায়কাল। আর কথিত বর্ণনামতে, হায়কালকে ঘিরে রেখেছে কুরসী। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। ইবনে ওয়াহাব হায়কাল এর ব্যাখ্যায় বলেন, হায়কাল আকাশমণ্ডলীর চতুস্পার্শ্বস্থ একটি বস্তুবিশেষ– যা আসমানের প্রান্ত থেকে তাবুর লম্বা রশির ন্যায় জমিনসমূহ ও সমুদ্রসমূহকে ঘিরে রেখেছে।

কতেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, কুরসী হচ্ছে অষ্টম আকাশ, যাকে স্থির গ্রহরাজির কক্ষ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের এ ধারণা যথার্থ নয়। কারণ পূর্বেই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে, কুরসী সাত আকাশ অপেক্ষা অনেক অনেকগুণ বড়।

[২৭]. তাফসীরে তাবারী : ৩/১০।

[২৮]. মুরসাল হাদীস হল সেসব হাদীস যার সনদে সূত্র বিচ্ছিন্নতা আছে। যেমন তাবেয়ী সরাসরি রাসূলের বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে এ সনদের মান মুরসাল হবে। যেহেতু তাবেয়ী যে সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেননি। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ যে-সকল ক্ষেত্রে মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন তার কয়েকটি হলো:

১. যদি মুরসাল হাদীস কোন সহীহ হাদীসের পক্ষে থাকে।

২. যদি মুরসাল হাদীসের পক্ষে সাহাবীদের আছার থাকে এবং বিপক্ষে সহীহ সনদে হাদীস না থাকে।

৩. আমলে মুতাওরাছার (যে আমল ধারাবাহিকভাবে উম্মতের মধ্যে চলে আসছে) পক্ষে।

৪. মুরসাল হাদীসের বিপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস নেই, সাহাবীদের আছার নেই সে-ক্ষেত্রে কিয়াস না করে মুসরাল হাদীস থেকে মাসআলা দেওয়া হয়। বিশেষ করে রাবী যদি তাবেয়ী পর্যায়ের হয় বা বিশ্বস্ত হয়।

৫. একই বিষয়ে যদি একাধিক মুরসাল হাদীস পাওয়া যায় এবং বিপরীতে সহীহ হাদীস না থাকলে। এরকম নীতি আরও আছে। এগুলো মুরসাল হাদীসের ব্যাপারে হানাফী মাসলাকের ইজতিহাদগত উসূল।

তাছাড়া একটু আগে উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, কুরসীর তুলনায় আকাশ বিশাল প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত একটি কড়ার ন্যায়। কিন্তু এক আকাশের তুলনায় আরেক আকাশ তো এরূপ নয়।

যদি এরপরও তাদের কেউ এ কথা বলে, আমরা তা স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে ফালাক বা আসমান নামে অভিহিত করি। তাহলে আমরা বলব, অভিধানে কুরসী আর ফালাক এর অর্থ এক নয়। বস্তুত প্রাচীন যুগের একাধিক আলিমের মতে, কুরসী আরশের সম্মুখে অবস্থিত আরোহনের সিড়ির মতো একটি বস্তুবিশেষ। আর এরূপ বস্তু ফালাক হতে পারে না।

তাদের আরও ধারণা, স্থির নক্ষত্রসমূহকে তাতেই স্থাপন করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়া এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

নবী-রাসূলের আলোকিত জীবন

[২য় খণ্ড]

নবী-রাসূলের আলোকিত জীবন

[২য় খণ্ড]

ইমাম হাফিয

ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর দিমাশকী

[৭০০ – ৭৭৪ হি.]

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

অনূদিত

প্রকাশনায়

আনোয়ার লাইব্রেরী

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ | অক্টোবর ২০২০ইং

নবী-রাসূলের আলোকিত জীবন (২য় খণ্ড)

মূল | ইমাম হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা
ইসমাঈল ইবনে ইসমাঈল ইবনে কাসীর দিমাশকী

অনুবাদ | কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

প্রকাশক | মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব | প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য | ৭০০.০০ টাকা মাত্র

অর্পণ

ভাতিজা
আইয়াশ দানিয়াল-কে

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বনী ইসরাঈলের তীহ প্রান্তরে প্রবেশ ও অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী ১৫
আল্লাহর দীদার লাভের জন্য মূসা আ.-এর প্রার্থনা ২৫
বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজার বিবরণ ৩৩
ইবনে হিব্বানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস.................................৫০
বনী ইসরাঈলের গাভীর ঘটনা..৫৫
মূসা আ. ও খিযির আ.-এর ঘটনা...৫৯
মূসা আ.-এর কাহিনী সম্বলিত পরীক্ষার হাদীস ৭৩
তাঁবু গম্বুজের নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনা ৯২
মূসা আ.-এর সাথে কারূনের ঘটনা ৯৫
মূসা আ.-এর মর্যাদা, স্বভাব, গুণাবলী ও ওফাত ১০৩
মূসা আ.-এর বায়তুল্লাহয় হজ্জ পালন ১১৩
মূসা আ.-এর ইন্তিকাল.. ১১৫
ইউশা আ.-এর নবুওয়াত লাভ এবং বনী ইসরাঈলের দায়িত্ব গ্রহণ ১২১
খিযির আ. ও ইলিয়াস আ.-এর ঘটনা..১৩৫
ইলিয়াস আ. ১৬১
হযরত মূসা আ.-এর পরবর্তী বনী-ইসরাঈলের নবীগণের বিবরণ........... ১৬৭
হিযকীল আ.-এর ঘটনা.. ১৬৯
হযরত আল-ইয়াসা আ.-এর ঘটনা ১৭৩
শামুয়েল নবীর ঘটনা.. ১৭৬
হযরত দাউদ আ.-এর ঘটনা, তাঁর ফযীলত, কর্মকাণ্ড ও নবুওতের দলিল-প্রমাণ..... ১৮৭
হযরত দাউদ আ.-এর ইনতিকাল... ২০২
হযরত সুলায়মান আ.-এর ঘটনা... ২০৫
সুলায়মান আ.-এর রাজত্বকাল, আয়ু ও মৃত্যু ২২৩
দাউদ এবং যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আ.-এর মধ্যবর্তী ইসরাঈল বংশীয় নবীগণের ইতিহাস ২৩৭
হযরত শাইয়া ইবনে আমসিয়া ২৩৭
লাবী ইবনে ইয়াকুবের বংশধর হযরত আরমিয়া ইবনে হালকিয়া............. ২৩৯
বায়তুল মাকদিস ধ্বংসের ঘটনা... ২৪০

বিষয় পৃষ্ঠা

হযরত দানিয়াল আ.-এর ঘটনা ২৫৫
বিধ্বস্ত বায়তুল মাকদিস পুনঃনির্মাণ এবং বিক্ষিপ্ত বনী ইসরাঈলের পুনরায় একত্রিত হওয়ার বর্ণনা ২৫৯
হযরত উযায়র আ.-এর ঘটনা.. ২৬৩
যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আ.-এর ঘটনা ২৭১
হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর হত্যার বর্ণনা.. ২৮৬
হযরত ঈসা আ.-এর ঘটনা... ২৯১
সতী-সাধ্বী নারী মারইয়ামের পুত্র হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের আলোচনা...... ৩০৫
আল্লাহ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র সংক্রান্ত আলোচনা.......................... ৩২৩
হযরত ঈসা আ.-এর জন্ম ও ওহীর সূচনা...................................... ৩৩৭
প্রসিদ্ধ চারটি আসমানী কিতাব নাযিলের সময়কাল.............................৩৪৪
তূবা বৃক্ষের বর্ণনা..৩৪৬
আসমানী খাঞ্চার বিবরণ...৩৬৪
পরিচ্ছেদ ৩৬৭
হযরত ঈসা আ.-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার বর্ণনা...........................৩৭৬
ঈসা আ.-এর গুণাবলী, স্বভাব-চরিত্র ও মাহাত্ম্য...............................৩৮৭
পরিচ্ছেদ ৩৯৬
বেথেলহাম ও কুমামার ভিত্তি স্থাপন...৩৯৭
অতীতকালের ঘটনা ৩৯৮
যুল-কারনাইনের ঘটনা...৩৯৯
আবে-হায়াতের সন্ধানে যুল-কারনাইন...৪০৭
আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা ৪১৯
একজন ঈমানদার একজন কাফিরের ঘটনা...................................... ৪৩১
উদ্যান মালিকদের ঘটনা...৪৩৮
শনিবার-বিষয়ক সীমা লংঘনকারী আয়লা অধিবাসীদের ঘটনা............... ৪৪২
হযরত লুকমান আ.-এর ঘটনা ৪৪৭
অগ্নিকুণ্ড অধিপতিদের ঘটনা ৪৫৯
বনী ইসরাঈল থেকে ঘটনা বর্ণনায় অনুমতি প্রসঙ্গে............................ ৪৬৬
বনী ইসরাঈলের তাপস জুরায়জের ঘটনা ৪৭১
বারসীসা-এর ঘটনা ৪৭৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারী তিন ব্যক্তির ঘটনা ৪৭৭
অন্ধ, কুষ্ঠ ও টাক মাথাওয়ালা তিন ব্যক্তির ঘটনা ৪৭৮
এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার নিয়ে তা পরিশোধের ঘটনা ৪৮০
সততা ও আমানতের আরও ঘটনা ৪৮২
আরেকটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৪৮৪
তওবাকারী দু'রাজার ঘটনা ৪৮৮
পরিচ্ছেদ ৪৯৬
ইয়াহুদি-নাসারাদের দীন বিকৃতির বিবরণ ৪৯৭
পূর্বতন নবীগণের বিবরণ বিষয়ক অধ্যায় ৫০৯
আরব জাতির বর্ণনা ৫১৭
সাবা বাসীদের বর্ণনা ৫২২
পরিচ্ছেদ ৫২৯
রবীআ আন নাসর লাখমীর বিবরণ ৫৩০
মদীনা অধিবাসীদের সাথে তুব্বা সম্রাট আবু কুরাবের ঘটনা ৫৩৪
লাখনীআহ যূশানাতির-এর ইয়ামান আক্রমণ ৫৪২
ইয়ামানের রাজত্ব হিমইয়ার গোত্র থেকে সুদানী হাবশীদের কবলে আসা প্রসঙ্গ....... ৫৪৪
আরয়াতের বিরুদ্ধে আবরাহা আশরামের বিদ্রোহ ৫৪৫
কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কায় আবরাহার হাতি বাহিনী প্রেরণ ৫৪৬
হাবশীদের হাত থেকে রাজত্ব সায়ফ ইবুন যু-ইয়াযানের হাতে রাজত্ব স্থানান্তর ৫৬২
ইয়ামানে পারসিকদের শেষ পরিণতি ৫৬৯
হাযর অধিপতি সাতিরূন-এর বিবরণ ৫৭২
আঞ্চলিক রাজাদের বিবরণ ৫৭৬

প্রারম্ভিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কিতাব আল-কুরআন উপহার দিয়েছেন, যাতে রয়েছে হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণের হাজারো উপকরণ। বিশেষ করে কুরআনের সুন্দরতম কাসাস তথা ঘটনাবলী আমাদের উপদেশ ও নসীহত গ্রহণের আমীয় বাণী। আল-কুরআনে অতীত কালের জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের ঘটনাবলী এবং কাহিনীগুলো বর্ণনা করে তাদের প্রকৃতি, স্বভাব, পরিণতি ও পরিণামের দিক নির্দেশ করে। অতীত কালের ইতিহাস নির্ভর, বিভিন্ন ঘটনা ও কিসসা বর্ণনা করা আল-কুরআনের মূল উদ্দেশ্য নয়। তবে অতীত কালের ঐতিহাসিক কাহিনী ও ঘটনার সঠিক বর্ণনা আল-কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সেই উপমা, উদাহরণ এবং কাহিনী চিত্রায়ণের উদ্দেশ্য হলো দীনি দাওয়াতকে মানুষের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরা। আল-কুরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের প্রাচীন জাতিসমূহ এবং প্রসিদ্ধ নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলীর বিবরণ অন্যতম। এ সকল কাহিনীর মধ্যে মানব জাতির সর্বস্তরে চিরকাল উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের বহুবিধ উপকরণ রয়েছে। আলোচ্য কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে নবী-রাসূলগণের জীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন জগদ্বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইমাম ইবনে কাসীর রহ.।

আমরা জানি, মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অনেক নবীরূাসূল নিযুক্ত করেছেন। নবীরা মানুষ ছিলেন। তবে তাঁদেরকে নবী নিযুক্ত করে তাঁদের কাছে আল্লাহ নিজের বানী পাঠিয়েছেন। তাঁদেরকে তিনি সবকিছু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং তাঁরা একদিকে ছিলেন সত্য ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। অন্যদিকে ছিলেন উন্নত চরিত্র ও নিস্পাপ জীবনের অধিকারী। ছিলেন আদর্শ মানুষ। তাঁরা অহীর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী লাভ করতেন। তাঁরা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করতেন না।

আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব করার জন্য। তাঁর হুকুম পালন করার জন্য। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য। সেই সাথে পৃথিবীটাকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য। এই হল মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ নবীদের পাঠিয়েছেন মানুষকে তাঁদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানিয়ে দিতে এবং কথাটা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে।

মহান আল্লাহ যাদের নবী নিযুক্ত করেছেন, তাঁরা সারা জীবন মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন

করতে বলেছেন। নফসের তাড়না এবং শয়তানের পথ পরিহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে তাঁদের অনুপ্রানিত করেছেন।

নবীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁর সন্তুষ্টির পথে জী বন যাপন করে, তবে মৃত্যুর পর যে চিরন্তন জীবন আছে, সেখানে তাঁরা মহা সুখে জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন ধারন করবেন না। মৃত্যুর পরের জীবনে তাঁদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি আর শাস্তি। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথের সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বলেই তাঁদেরকে নবী ও রাসূল বলা হয়। সকল রাসূলই নবী ছিলেন। তবে সকল নবী রাসূল ছিলেন না। অনেক নবীর কাছে আল্লাহ তায়ালা শুধু অহী পাঠিয়েছেন। আবার অনেক নবীর কাছে অহী এবং কিতাবও পাঠিয়েছেন। যারা সাধারণভাবে অহী লাভ করা ছাড়াও কিতাব লাভ করেছেন, তারাই ছিলেন রাসূল।

প্রথম নবী ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম আ.। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালাম। তাঁর পরে পৃথিবীতে আল্লাহ আর কোনো নবী নিযুক্ত করবেন না। পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা ঠিক কতজন মানুষকে নবী নিযুক্ত করেছেন, তা মানুষের পক্ষে কখনোই জানা সম্ভব নয়। একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালা এক লক্ষ বিশ হাজার নবী পাঠিয়েছেন। এদের মধ্যে তিনশত পনেরজন ছিলেন রাসূল। তবে তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

নবী-রাসূলগণের প্রতি অবশ্যি ঈমান আনতে হবে। কুরআনে যে পঁচিশজনের নাম উল্লাখ আছে, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি পৃথকভাবে ঈমান আনতে হবে। তাঁদের কারো প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। আর যেসব নবী-রাসুলের নাম কুরানে উল্লেখ করা হয়নি, তাঁদের প্রতি সামগ্রিকভাবে ঈমান আনতে হবে।

নবীগণ মানুষকে কল্যাণের পথে ডেকেছেন। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার অন্ধ মোহে লিপ্ত হয়ে নবীদের বিরোধিতা করেছে। তাঁদের অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়েছে। অত্যাচার নির্যাতন করেছে। অনেক নবীকে লোকেরা নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। আল্লাহর এই মহান নবীগণকে মানুষ হত্যা করার কূট-কৌশল করেছে। অগনিত নবীকে তাঁরা হত্যা করেছে। কাউকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে। কাউকে তারা হত্যা করার জন্য তাড়া করেছে। কাউকে হত্যা করার জন্য বাড়ি ঘেরাও করেছে। এত চরম বিরোধিতা স্বত্তেও নবীগণ সত্য পথের দিকে দাওয়াত দান থেকে কখনই বিরত থাকেননি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষকে সত্য পথে আসার আহবান জানিয়ে

গেছেন। তাঁরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাজ গড়ার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এখন আমাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হল যে, পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ দুটি। একটি হল নবীদের দেখানো পথ। এটিই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ। এ পথের প্রতিদান হল জান্নাত বা বেহেশত।

অপরটি হল আল্লাহদ্রোহীতার পথ। এটি আল্লাহকে অমান্য করার পথ। আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ। নবীদের অমান্য করার পথ। শয়তানের পথ। আত্মার দাসত্বের পথ। এ পথের পরিনাম হল জাহান্নাম, চির শাস্তি, চির লাঞ্ছনা, চির অকল্যান আর ধ্বংস। আমাদেরকে চলতে হবে আল্লাহর পথে। চলতে হবে নবীদের পথে। নবীদের দেখানো পথই হল আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ। নবীদের পথই দুনিয়ার কল্যাণের পথ। নবীদের পথই জান্নাতের পথ। নবীদের পথ শান্তির পথ। নবীদের দেখানো পথ সুন্দর পৃথিবী গড়ার পথ। নবীদের দেখানো পথ আদর্শ মানুষ হবার পথ। নবীদের পথ উন্নতির পথ, শ্রেষ্ঠত্বের পথ।

তাই আসুন আমরা নবীদের জীবনী পড়ি। তাঁদের আদর্শকে জানি। তাঁদের ভালোবাসি। তাঁদের আদর্শের অনুসরন করি এবং তাঁদের দেখানো পথে চলি। আল-কুরআনে বর্ণিত কাসাস জীবন ও জগত সম্পর্কে মানব জাতির অতীত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। জীবন ও জগত সম্পর্কে মানুষ তার নিজের পুর্বধারণা, তার স্বজাতীয় অতীত ঘটনাবলী, কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যালোচনা করেই ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করে, সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। মানব জাতির নৈতিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক সম্পর্ক হোক, আর রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হোক অতীত ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেই তাদের সুখ, দুঃখ, ভালো-মন্দের মাপকাঠি নির্ণীত হয়। আল-কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও সভ্যতার আলোচনা দ্বারা শিক্ষা প্রদানই আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য। আল-কুরআনে উল্লিখিত সকল কিসসাই ব্যক্তির জীবনে কোনো না কোনো স্তরে উপকার দিচ্ছে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আছে। তাই আমরা গ্রন্থকারের বিন্যাসিত নবী-রাসূলগণের জীবনীভাষ্যের শেষদিকে ড. মোঃ আব্দুল কাদের প্রণীত 'নবী-রাসূলগণের ঘটনায় রয়েছে শিক্ষা' অবলম্বনে কয়েকজন নবীর ঘটনাবলী থেকে উপদেশ গ্রহণের এবং শিক্ষনীয় বিষয়ের দিক-নিদের্শনা প্রাপ্তি নিয়ে আলোচনা করেছি।

স্মর্তব্য, আলোচ্য গ্রন্থটি মূলত *কাসাসুল আম্বিয়া* গ্রন্থের অনূদিত রূপ। যার প্রথম খণ্ড ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এটি ২য় খণ্ড। নবী-রাসূলগণের জীবনী সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন বিশ্বনন্দিত মুসলিম মনীষী ও বিখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনে কাসীর রহ.। আমরা আশা করি নবী-রাসূলদের ঘটনাবলির আলোচনা প্রাণের উর্বরতা ও ঈমানের সজীবতা বৃদ্ধিতে সকলের সহায়ক হবে। তাঁদের জীবনের বিশাল পৃষ্ঠায় শিহরণ-জাগানিয়া বহু মূল্যবান ঘটনা আমাদের অন্ধকার

হৃদকমলে দেখাবে সফেদ আলো। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বাড়তি কিছু বলা বাহুল্য মনে করছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা আরবী প্রতিবর্ণায়নের প্রাচীন রীতি অনুসরণ করেছি। মূল পাঠের অনুবাদে সহায়তা নেওয়া হয়েছে আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইফাবা সংস্করণের। কুরআনে তরজমা গ্রহণ করা হয়েছে আল-বায়ান থেকে। হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনূদিত ও বাংলা হাদীস কর্তৃক সংযোজিত সংস্করণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় অংশে সংযোজন করা হয়েছে টীকা ও নোট।

দেশের প্রতিশ্রুতিশীল ও স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আনোয়ার লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপক মুহতারাম মাওলানা মোস্তফা সাহেব যেভাবে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়ে অনুবাদকর্মে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন তা এককথায় বর্ণনাতীত। তাঁর নিষ্ঠা, ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাকে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ঋণের শিকল পরিয়ে দিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শোকর আদায় করছি, যিনি আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পন্ন করার তাওফিক দিয়েছেন। সেই বরকতওয়ালা সত্তা যেন আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ সা.-এর পরিপূর্ণ ইত্তেবা ও অনুসরণ করে জীবন ও মৃত্যু দান করেন।

এ কথা কারও অজানা নয় যে, নবী-রাসুলের জীবনীভিত্তিক বই শুধু বই-ই নয়; তা একটি অমূল্য রত্ন। সাফল্যের সিঁড়ি। সোনালি জীবনের সোপান। বিশেষ করে আকাবিরদের লেখা বই-পুস্তক আমাদের ঈমানের খোরাক। আমলে জজবা আনার অন্যতম উপায়। তাই একটি নির্ভুল, সুন্দর ও সহজপাঠ্য বই লেখা, অনুবাদ করা বা পড়া সকলেরই ঐকান্তিক কাম্য। তথাপি মানুষ তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অনুবাদ কাজে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসামঞ্জস্যতা, ভাষা প্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠকেরা এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মৌলিক কোনো বিচ্যুতি চোখে পড়লে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে—ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কাজে বরকত দিন এবং কবুলিয়াতের বারিধারায় সিক্ত করুন।

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
ঢালকানগর, ঢাকা।
২ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঈসায়ী।

বনী ইসরাঈলের তীহ প্রান্তরে প্রবেশ ও অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী

ইতোপূর্বে জালিম জাতির বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের জিহাদ করা হতে বিরত থাকার বিষয়ক আলোচনা গত হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে তীহ প্রান্তরে, ভবঘুরের মতো বিচরণের শাস্তি দেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, চল্লিশ বছর তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না।

আহলে কিতাবদের বিভিন্ন বই-পুস্তকে জিহাদ থেকে বিরত থাকার বিষয়টি আমার চোখে পড়েনি বরং তাদের কিতাবে রয়েছে, মূসা আ. একদিন ইউশা আ.-কে কাফিরদের একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। আর মূসা আ., হারূন আ. ও খোর নামক এক ব্যক্তি একটি টিলার চূড়ায় বসেছিলেন। মূসা আ. তাঁর লাঠি উপরের দিকে উঠালেন। যখনই তিনি তাঁর লাঠি উপরের দিকে উঠিয়ে রাখতেন, তখনই ইউশা আ. শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হতেন। আর যখনই লাঠিসহ তার হাত ক্লান্তি কিংবা অন্য কারণে নিচে নেমে আসত তখনই শত্রুদল বিজয়ী হতে থাকত। তাই হারূন আ. ও খোর মূসা আ.-এর দুই হাতকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ডানে, বামে শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। ইউশা আ.-এর সৈন্য দল জয়লাভ করল।

কিতাবীদের মতে, ইউশা আ.-এর সেনাবাহিনী সকলে মাদায়ানকে পছন্দ করত। মূসা আ.-এর শ্বশুরের কাছে মূসা আ.-এর যাবতীয় ঘটনার সংবাদ পৌঁছল। আর এ খবর পৌঁছল যে, কীভাবে আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে তার শত্রু ফিরআউনের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। তাই তিনি মূসা আ.-এর কাছে আনুগত্য সহকারে উপস্থিত হলেন। তাঁর সাথে ছিলেন তার মেয়ে সাফফুরা। সাফফুরা ছিলেন মূসা আ.-এর স্ত্রী। তার সাথে মূসা আ.-এর দুই পুত্র জারশুন এবং আযরও ছিলেন। মূসা আ. তাঁর শ্বশুরের সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাঁকে সম্মান জানালেন। তাঁর সাথে বনী ইসরাঈলের বয়োবৃদ্ধরাও সাক্ষাত করলেন, তারাও তাঁর প্রতি সম্মান দেখালেন।

আহলে কিতাবদের বিভিন্ন গ্রন্থে রয়েছে, মূসা আ.-এর শ্বশুর দেখলেন, ঝগড়া-বিবাদের সময় বনী ইসরাঈলের একটি দল মূসা আ.-এর কাছে ভিড় জমায়। তাই তিনি মূসা আ.-কে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন জনগণের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক আমানতদার, পরহেযগার ও চরিত্রবান প্রশাসক নিযুক্ত

করেন- যারা ঘুষ ও খিয়ানতকে ঘৃণা করেন। তিনি যেন তাদেরকে নিযুক্ত করেন বিভিন্ন স্তরের প্রধানরূপে। যেমন প্রতি হাজারের জন্য, প্রতি শতের জন্য, প্রতি পঞ্চাশজনের জন্য এবং প্রতি দশজনের জন্য একজন করে। তারা জনগণের মধ্যে সমাধা করবেন বিচারকার্য। তাদের কর্তব্য সমাধানে যদি কোনো প্রকার সমস্যা দেখা দেয়, তখন তারা আপনার কাছে ফায়সালার জন্য আসবে এবং আপনি তাদের সমস্যার সমাধান দেবেন। মূসা আ. সেরূপ শাসনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন।

কিতাবীরা আরো বলেন, মিসর থেকে বের হবার তৃতীয় মাসে বনী ইসরাঈলরা সিনাইর কাছে সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। তারা তাদের কাছে চলতি বছরের প্রথম মাসে মিসর থেকে বের হয়েছিলেন। এটা ছিল বসন্ত ঋতুর সূচনাকাল। কাজেই তারা যেন গ্রীষ্মের প্রারম্ভে তীহ নামক ময়দানে প্রবেশ করেছিলেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞাত।

কিতাবীরা বলেন, বনী ইসরাঈলরা সিনাইয়ের তূর পাহাড়ের পাশেই অবতরণ করেন। এরপর মূসা আ. তূর পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং তাঁর প্রতিপালক তার সাথে কথা বলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হুকুম দিলেন, তিনি যেন বনী ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলা যেসব নিয়ামত প্রদান করেছেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে যেন শকুনের দুইটি পাখায় উঠিয়ে ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন বনী ইসরাঈলকে পবিত্রতা অর্জন করতে, গোসল করতে, কাপড়-চোপড় ধুয়ে তৃতীয় দিবসের জন্য তৈরি হতে হুকুম দেন।

তৃতীয় দিন সমাগত হলে তিনি নির্দেশ দেন, তারা যেন পাহাড়ের পাশে সমবেত হন, তবে তাদের মধ্য হতে কেউ যেন মূসা আ.-এর কাছে না আসে। যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর কাছে আসে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শিংগার আওয়াজ শুনতে থাকবে, এমনকি একটি প্রাণীও তখন তার কাছে যেতে পারবে না। যখন শিংগার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাবে তখন পাহাড়ে যাওয়া তাদের জন্য বৈধ হবে। বনী ইসরাঈলও মূসা আ.-এর কথা শুনলেন; তাঁর আনুগত্য করলেন, গোসল করলেন; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেন; পবিত্রতা অর্জন করলেন ও খুশবু ব্যবহার করলেন। তৃতীয় দিন পাহাড়ের ওপর বিরাট মেঘখণ্ড দেখা দিল। সেখানে গর্জন শোনা গেল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ও শিংগার বিকট আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। এতে

বনী ইসরাইল ঘাবড়ে গেল ও অত্যন্ত আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা ঘর হতে বের হলো এবং পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়াল। পাহাড়কে বিরাট ধোঁয়ায় ঢেকে ফেলল, তার মধ্যে ছিল অনেকগুলো নূরের স্তম্ভ।

সমস্ত পাহাড় প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে লাগল, শিংগার গর্জন অব্যাহত রইল এবং ক্রমাগত তা বৃদ্ধি পেতে লাগল। মূসা আ. ছিলেন পাহাড়ের উপরে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে একান্তে কথা বলছিলেন। আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে নেমে যেতে হুকুম দিলেন। মূসা আ. বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তাআলার কালাম শোনার জন্য পাহাড়ের নিকটবর্তী হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের আলেমদেরকেও তিনি নিকটবর্তী হতে আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর অধিক নৈকট্য অর্জন করার জন্য তাদেরকে পাহাড়েও চড়তে হুকুম দিলেন।

উপরোক্ত সংবাদটি হলো কিতাবীদের গ্রন্থাদিতে লিখিত সংবাদ যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়।

মূসা আ. বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এরা পাহাড়ে চড়তে সক্ষম নয় আর তুমি পূর্বে একাজ করতে নিষেধ করেছিলে। এরপর আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে তার ভাই হারূন আ.-কে নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। আর আলিমগণ এবং বনী ইসরাঈলের অন্যরা যেন নিকটে উপস্থিত থাকে। মূসা আ. তাই করলেন। তাঁর প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন।

তখন আল্লাহ তাআলা তাকে দশটি কলেমা বা উপদেশ বাণী দিলেন। কিতাবীদের মতে, বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর কালাম শুনেছিল কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি, যতক্ষণ না মূসা আ. তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর মূসা আ.-কে তারা বলতে লাগল, আপনি প্রতিপালকের কাছ থেকে আমাদের কাছে উপদেশ বাণী পৌঁছিয়ে দিন। আমরা আশংকা করছি হয়তো আমরা মারা পড়ব। এরপর মূসা আ. তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে প্রাপ্ত দশটি উপদেশ বাণী পৌঁছিয়ে দেন। আর এগুলো হচ্ছে : (এক) লা-শরীক আল্লাহ তাআলার ইবাদতের নির্দেশ, (দুই) আল্লাহ তাআলার সাথে মিথ্যা শপথ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, (তিন) সাবাত সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ। তার অর্থ হচ্ছে সপ্তাহের একদিন অর্থাৎ শনিবারকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট রাখা। শনিবারকে রহিত করে আল্লাহ তাআলা এর বিকল্পরূপে আমাদেরকে জুমআর দিন দান করেছেন। (চার) তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান কর। তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা তোমার আয়ু বৃদ্ধি করে দেবেন, (পাঁচ) নর হত্যা করবে না, (ছয়) ব্যভিচার করবে না, (সাত) চুরি করবে না, (আট) তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, (নয়)

তোমার প্রতিবেশীর ঘরের প্রতি লোভের দৃষ্টিতে তাকাবে না, (দশ) তোমার সাথীর স্ত্রী, গোলাম-বাঁদী, গরু-গাধা ইত্যাদি কোনো জিনিসে লোভ করবে না। অর্থাৎ হিংসা থেকে বারণ করা হয়। আমাদের প্রাচীনকালের আলিমগণ ও অন্য অনেকেই বলেন, এ দশটি উপদেশ বাণীর সারমর্ম কুরআনের সূরায়ে আনআমের দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا
اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ
الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا
اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۵۲﴾ وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ
ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

"আপনি বলুন : এস, আমি তোমাদেরকে ওইসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই, নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। এতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।„[২৯]

---

[২৯]. সূরা আনআম : আয়াত ১৫১-১৫৩।

তারা এই দশটি উপদেশ বাণীর পরও বহু ওসীয়ত ও বিভিন্ন মূল্যবান নির্দেশাবলীর উল্লেখ করেছেন, যেগুলো বহুদিন যাবত চালু ছিল। তারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এগুলো আমল করেছেন কিন্তু এরপরই এগুলোতে আমলকারীদের পক্ষ হতে অবাধ্যতার ছোঁয়া লাগে। তারা এগুলোর দিকে লক্ষ করলো এবং এগুলোতে পরিবর্তন সাধন করল, কোনো কোনোটা একেবারে বদল করে দিল; আবার কোনো কোনোটার মনগড়া ব্যাখ্যা দান করতে লাগল। তারপর এগুলোকে একেবারেই তারা ছেড়ে দিল। এরূপ এসব নির্দেশ এককালে পূর্ণরূপে চালু থাকার পর পরিবর্তিত ও বর্জিত হয়ে যায়। পূর্বে ও পরে আল্লাহ তাআলার হুকুমই বলবৎ থাকবে, তিনিই যা ইচ্ছে হুকুম করে থাকেন এবং যা ইচ্ছে করে থাকেন। তাঁরই হাতে সৃষ্টি ও আদেশের মূল চাবিকাঠি। জগতের প্রতিপালক আল্লাহই বরকতময়। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَ وٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوٰى ﴿۸۰﴾ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَ مَنْ يَّحْلِلْ
عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ﴿۸۱﴾ وَ اِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿۸۲﴾

"হে বনী-ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের কাছে 'মান্না' ও 'সালওয়া', নাযিল করেছি। বলেছিঃ আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন করো না, তা হলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধবংস হয়ে যায়। আর যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল।"[৩০]

আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছিলেন সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করেছিলেন, বিপদ-আপদ ও সংকীর্ণ অবস্থা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। আর তাদেরকে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের নবী মূসা আ.-এর সঙ্গ দান করার জন্য অংগীকার করেছিলেন যাতে তিনি তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধান অবতীর্ণ করতে পারেন। আর আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর মান্না আসমান থেকে প্রতি প্রত্যুষে নাযিল করেন।

---

[৩০]. সূরা তোয়াহা : আয়াত ৮০-৮২।

তাদের জন্য অতি প্রয়োজনের বেলায় কঠিন সময়ে এমন ভূমিতে ভ্রমণ ও অবস্থানকালে যেখানে কোনো প্রকার ফসলাদি ও দুধেল প্রাণী ছিল না।

প্রতিদিন সকালে তারা মান্না ঘরের মাঝেই পেয়ে যেত এবং তাদের প্রয়োজন মুতাবিক রেখে দিত যাতে ওইদিনের সকাল হতে আগামী দিনের ওই সময় পর্যন্ত তাদের খাওয়া-দাওয়া চলে। যে ব্যক্তি এরূপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করে রাখত তা নষ্ট হয়ে যেত; আর যে কম গ্রহণ করত এটাই তার জন্য যথেষ্ট হত; যে অতিরিক্ত নিত তাও অবশিষ্ট থাকতো না। মান্না তারা রুটির মতো করে তৈরি করত এটা ছিল ধবধবে সাদা এবং অতি মিষ্ট। দিনের শেষ বেলা সালওয়া নামক পাখি তাদের কাছে এসে যেত, রাতের খাবারের প্রয়োজন মতো পরিমাণ পাখি তারা অনায়াসে শিকার করত। গ্রীষ্মকাল দেখা দিলে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর মেঘখণ্ড প্রেরণ করে ছায়া দান করতেন। এই মেঘখণ্ড তাদের প্রখরতা ও উত্তাপ থেকে রক্ষা করত।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾

"হে বনী ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় কর আমাকেই। আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুতঃ তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিও না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ।"[৩১]

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَاِذْ اٰتَيْنَا

৩১. সূরা বাকারা : আয়াত ৪০-৪১।

مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۗ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۗ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

"আর (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরআউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুতঃ তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মহা পরীক্ষা। আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে। আর যখন আমি মূসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে জালিম। তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার। আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ এই গোবৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তাওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান। আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। তারপর, মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও সালওয়া'। সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষন কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি।

বস্তুতঃ তারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে।”[৩২]

وَاِذِ اسۡتَسۡقٰی مُوۡسٰی لِقَوۡمِهٖ فَقُلۡنَا اضۡرِبۡ بِّعَصَاكَ الۡحَجَرَ ؕ فَانۡفَجَرَتۡ مِنۡهُ اثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنًا ؕ قَدۡ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشۡرَبَهُمۡ ؕ كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا مِنۡ رِّزۡقِ اللّٰهِ وَلَا تَعۡثَوۡا فِی الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ ۝ وَاِذۡ قُلۡتُمۡ يٰمُوۡسٰی لَنۡ نَّصۡبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُخۡرِجۡ لَنَا مِمَّا تُنۡۢبِتُ الۡاَرۡضُ مِنۡۢ بَقۡلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوۡمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسۡتَبۡدِلُوۡنَ الَّذِیۡ هُوَ اَدۡنٰی بِالَّذِیۡ هُوَ خَيۡرٌ ؕ اِهۡبِطُوۡا مِصۡرًا فَاِنَّ لَكُمۡ مَّا سَاَلۡتُمۡ ؕ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ الذِّلَّةُ وَالۡمَسۡكَنَةُ ۗ وَبَآءُوۡ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَانُوۡا يَكۡفُرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقۡتُلُوۡنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوۡا يَعۡتَدُوۡنَ ۝

”আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়িও না। আর তোমরা যখন বললে, হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদ্য-দ্রব্যতে কখনও ধৈর্য্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, ফাঁকুড়, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মূসা আ. বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? তোমরা কোনো নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহর বিধিবিধান মানতো না এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘকারী।”[৩৩]

এখানে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন ও অনুগ্রহ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুটো সুস্বাদু খাবার বিনাকষ্টে ও পরিশ্রমে সহজলভ্য করে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন ভোরে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য মান্না অবতীর্ণ করতেন এবং সন্ধ্যার সময়

[৩২]. সূরা বাকারা : আয়াত ৪৯-৫৭।

[৩৩]. সূরা বাকারা : আয়াত ৬০-৬১।

সালওয়া নামক পাখি প্রেরণ করতেন। মূসা আ.-এর লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার ফলে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা পানি প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। তারা এই পাথরটিকে তাদের সাথে লাঠি সহকারে বহন করত। এই পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হত; প্রতিটি গোত্রের জন্য একটি প্রস্রবণ নির্ধারিত ছিল। এই প্রস্রবণগুলো পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত করত। তারা নিজেরা পান করত ও তাদের প্রাণীদেরকে পানি পান করাত এবং তারা প্রয়োজনীয় পানি জমা করেও রাখত। উত্তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য মেঘ দ্বারা তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ছায়া দান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার তরফ হতে তাদের জন্য ছিল এগুলো বড় বড় নিয়ামত ও দান। তবে তারা এগুলোর পূর্ণ মর্যাদা অনুধাবন করেনি এবং এগুলোর জন্য যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেনি। আর যথাযথভাবে ইবাদতও তারা আঞ্জাম দেয়নি। এরপর তাদের অনেকেই এসব নিয়ামতের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করল। এগুলোর প্রতি অধৈর্য হয়ে উঠল এবং চাইল যাতে তাদেরকে এগুলো পরিবর্তন করে দেয়া হয়। এমন সব বস্তু যা ভূমি উৎপন্ন করে যেমন শাক, সবজি, ফাঁকুড়, গম, মসুর ও পিয়াজ ইত্যাদি। এ কথার জন্য মূসা আ. তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন এবং ধমক দিলেন, তাদের সতর্ক করে বললেন।

ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল শহরের অধিবাসীর জন্য অর্জিত উৎকৃষ্ট নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে কি তোমরা নিকৃষ্টতর বস্তু চাও? তাহলে তোমরা যেসব বস্তু ও মর্যাদার উপযুক্ত নও তার থেকে অবতরণ করে তোমরা যে ধরনের নিকৃষ্ট মানের খাদ্য খাবার চাও তা তোমরা অর্জন করতে পারবে। তবে আমি তোমাদের আবদারের প্রতি সাড়া দিচ্ছি না এবং তোমরা যে ধরনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছ তাও আল্লাহ তাআলার দরবারে আপাতত পৌঁছাচ্ছি না।

উপরোক্ত যেসব আচরণ তাদের থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, মূসা আ. তাদেরকে যেসব কাজ থেকে বিরত রাখতে ইচ্ছে করেছিলেন তা থেকে তারা বিরত থাকেনি।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : “এ বিষয়ে সীমালংঘন করবে না, করলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার ওপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।”[৩৪]

[৩৪]. সূরা তোয়াহা : আয়াত ৮১।

বনী ইসরাঈলের ওপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার গযব অবধারিত হয়েছিল। তবে আল্লাহ তাআলা এরূপ কঠোর শাস্তিকে আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথেও সম্পৃক্ত করেছেন, ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে ও পাপরাশি থেকে তাওবা করে এবং বিতাড়িত শয়তানের অনুসরণে আর লিপ্ত না থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচল থাকে।"[৩৫]

[৩৫]. সূরা তোয়াহা : আয়াত ৮২।